আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকার সংকলন

দশ লেখক
দশ জীবন

কালি-কলম ও পথচলার গল্প

জহির উদ্দিন বাবর

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

শুরুর কথা

একজন মানুষ তার নিজের সম্পর্কে যতটা জানেন, ততটা আর কেউ জানে না। নিজের জীবনকাহিনি নিজে যত তথ্যবহুল ও বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে তুলে ধরতে পারেন, সেটা আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য জীবনীসাহিত্যে বরাবরই আত্মজীবনীমূলক গদ্যের বিশেষ কদর রয়েছে। একজন লেখক স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজের জীবনকাহিনি তুলে ধরতে পারেন, আবার কেউ নানা আঙ্গিকে প্রশ্ন করেও তার জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় উদঘাটন করতে পারেন। লেখক নিজে লিখলে অনেক সময় সব বিষয় উঠে আসে না, কিংবা নিজে ইচ্ছা করেই অনেক বিষয় এড়িয়ে যান; কিন্তু অন্যের প্রশ্নের জবাবে তাকে প্রায় সব বিষয়েই মুখ খুলতে হয়; অনেক তিক্ত ও বিব্রতকর প্রশ্নের উত্তরও দিতে হয়। এ জন্য সাধারণত সাক্ষাৎকারমূলক আত্মজীবনী পাঠকের কাছে বেশি আকর্ষণীয়।

বাংলা ভাষায় বিখ্যাত অনেক লেখকের আত্মজৈবনিক লেখনী রয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকারের ধারাও বেশ পুরোনো। তবে ইসলামি ধারায় এ ধরনের লেখনী খুব একটা চোখে পড়ে না। কয়েকজনের আত্মজীবনী থাকলেও আলেম লেখকদের আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকার নেই বললেই চলে। শীর্ষ আলেম লেখকদের আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকারের কোনো সংকলন আছে বলে আমার জানা নেই। এ জন্য *দশ লেখক দশ জীবন* বইটি এই ধারার একটি শুভসূচনা বলে দাবি করতে পারি—যদিও যতটা সামগ্রিকভাবে জীবনকাহিনি তুলে আনার কথা ছিল, সেটা এখানে সম্ভব হয়নি। কলেবর বেড়ে যাওয়ার ভয়ে লেখালেখিসংক্রান্ত বিষয়গুলোই এখানে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবুও সূচিবদ্ধ লেখকদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে পাঠক প্রাথমিক ধারণা পাবেন বইটিতে।

এখানে প্রথম ধাপে দশজন শীর্ষ আলেম লেখক সূচিবদ্ধ হয়েছেন। বিশেষ কোনো মানদণ্ডের ভিত্তিতে তাদের নির্বাচন করা হয়নি। আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ, যোগাযোগ, সর্বোপরি সহজে যাদের পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হয়েছে, তাদের সাক্ষাৎকারই এখানে নেওয়া হয়েছে। অনেকের পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হয়নি কিংবা তিনি সম্মত না হওয়ায় এখানে আমরা চাইলেও সূচিবদ্ধ

করতে পারিনি। এ জন্য অমুক কেন আছেন, অমুক কেন নেই—এ ধরনের প্রশ্ন তোলার সুযোগ কম। আর সূচিবদ্ধ দশজনের ক্রমবিন্যাস করা হয়েছে তাদের জন্মসন অনুযায়ী, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে; সুতরাং এটা নিয়েও আশা করি কেউ প্রশ্ন তুলবেন না। সাক্ষাৎকারের নিজ নিজ অংশ প্রত্যেক লেখককে দেখানো হয়েছে; অনেকে একাধিকবারও সংশোধন করে দিয়েছেন। এ জন্য তথ্যগত ভুল আশা করি নেই। এরপরও কোনো ভুল পেলে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে নেব। বিতর্কিত কোনো তথ্য বা বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের দায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির, কোনোক্রমেই সাক্ষাৎকারগ্রহীতা কিংবা প্রকাশকের নয়।

লেখা ও লেখকের কথা নিয়ে ২০১৯ সাল থেকে আমরা *লেখকপত্র* নামে একটি সাময়িকী বের করে আসছি; সেখানে প্রতি সংখ্যায় একজন আলেম লেখকের আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকার ছাপা হয়ে থাকে। মূলত সাক্ষাৎকারের একটি নির্বাচিত অংশ লেখকপত্রে ছাপা হয়, আর পুরো সাক্ষাৎকারটি স্থান পেয়েছে এই বইয়ে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর লেখকপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতি সংখ্যায় আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকার প্রকাশের ধারাও অব্যাহত আছে। ইনশাআল্লাহ, এই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে আরও বই আসবে বলে আশা করছি।

বরাবরের মতোই বইটি প্রকাশে আমার প্রতি আস্থা ও ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছেন রাহনুমা প্রকাশনীর অন্যতম কর্ণধার মাহমুদুল ইসলাম। বইটি প্রকাশের কথা বলতেই তিনি রাজি হয়ে গেছেন। মাহমুদ ভাই, কাওসার ভাই, নেসারুদ্দীন রুম্মান ভাইসহ বইটি প্রকাশে রাহনুমা প্রকাশনীর যারা যেভাবে ভূমিকা রেখেছেন, সবার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশিষ্টজনেরা যারা শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় নিয়ে কথা বলেছেন, নিজ নিজ অংশ সম্পাদনা করে দিয়েছেন, তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে যারা আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন, তাদের কাছেও ঋণী। আল্লাহ সবাইকে উত্তম বদলা দিন।

জহির উদ্দিন বাবর
পুরানা পল্টন, ঢাকা
২২ জানুয়ারি ২০২২

সূচিবদ্ধ হলেন যাঁরা

- মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী : ১৩-৫০
- মাওলানা ইসহাক ওবায়দী : ৫১-৭২
- আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ : ৭৩-১১০
- ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন : ১১১-১২৮
- মাওলানা লিয়াকত আলী : ১২৯-১৮০
- ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ : ১৮১-২১৮
- মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী : ২১৯-২৪৮
- মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন : ২৪৯-২৮৪
- মাওলানা ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী : ২৮৫-৩২০
- মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ : ৩২১-৩৭৬

লেখার জন্য বিখ্যাত মনীষীদের অনেক প্রশংসা পেয়েছি

মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী আল-আযহারী

বয়স আশি ছুঁইছুঁই। বার্ধক্যের এই পর্যায়ে এসেও দুই বছরে লিখেছেন প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠা! এই বয়সেও তিনি একজন সরব লেখক। ছয় দশকের বেশি সময় ধরে লিখে চলেছেন অনবরত। বাংলা ভাষায় ইসলামি ধারার সাহিত্যভান্ডার সমৃদ্ধ করতে যারা নিরলস কাজ করে চলেছেন, তাদের একজন তিনি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সব বড় বড় প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। জানাশোনা, অভিজ্ঞতা এবং কাজের বিস্তৃতিতে সম্ভবত জীবিত লেখকদের মধ্যে তিনি শীর্ষে। গোটা জীবনটাই তিনি নিবেদন করেছেন লেখালেখির জন্য। লেখাই তার নেশা, পেশা এবং ইবাদত। বর্ণাঢ্য জীবনের নানা অধ্যায় নিয়ে কথা বলেছেন প্রবীণ আলেম লেখক মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী।

[মার্চ ২০২০ লেখকের মিরপুরের বাসায় সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়; সঙ্গে ছিলেন হাসান আল মাহমুদ]

আপনার বয়স আশির কাছাকাছি। এই বয়সে সব মিলিয়ে কেমন আছেন?

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালার লাখো শোকর। কারণ, আমার বয়সী অনেকেই এখন আর নেই। পিছনে ফিরলে কাফেলায় আর সঙ্গের লোক দেখি না! যাদেরকে নিয়ে পথচলা শুরু করেছিলাম, পিছনে তাকালে দেখি তারা কেউ আর নেই! প্রায় সবাই চলে গেছেন—দুই-একজন ছাড়া। এ জন্য একটু অসহায়ও বোধ করি। আমাদের যারা বুঝতে পারতেন, সেই লোকগুলো আর নেই! যারা মূল্যায়ন করতেন, তারা চলে গেছেন। যারা নতুন এসেছে, অনেকেই চেনে না। যার ফলে একটু অসহায়ত্ব বোধ করি।

আপনার জন্ম কত সালে?

আমার আব্বা লিখে গেছেন, যা দেখেছি, ১৩৪৯ বাংলার ১৫ জৈষ্ঠ্য, শুক্রবার সকাল আটটা। ১৯৪২ সালের মে মাসের ২৯ তারিখ ছিল সেটি।

আপনার পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়টা বলবেন কি?

সিলেট শহর থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে টুকেরবাজারে আমাদের বাড়ি। আমরা সিলেটের তালুকদার পরিবারের সন্তান। সিলেটে তালুকদার ও জমিদার একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের বাড়িটা একদম নদীর পাড়ে। আমার শৈশবে নদী বেশ প্রবহমান ছিল। অনেক সুন্দর একটি বাড়ি। সুরমা নদীর দীর্ঘ বাঁক এখানে এসে ঘুরেছে। আমাদের বাড়ির একাংশও নদীগর্ভে চলে গেছে। তবে আমাদের বাড়িটি রয়ে গেছে।

জমিদার আর তালুকদারের মধ্যে পার্থক্য হল—জমিদারদের প্রজা থাকত, তারা জমির খাজনা তুলে সরকারকে দিত। এ জন্য সরকারের সব জুলুমের অংশীদার। আর তালুকদারের ব্যাপারটা তা ছিল না। তাদের রায়ত ছিল না, তবে তারা সরকারকে সরাসরি খাজনা দিত।

হাওড়-বাঁওড়ে পূর্ণ সিলেট এলাকাটি মাছের জন্য বিখ্যাত। বড় বড় অনেক হাওড় এই জেলায় রয়েছে। এখানকার অধিবাসীদের বড় একটি অংশ মৎস্যজীবী। আমাদের লোকেরাও বড় বড় হাওড়ের লিজ ও জলমহাল নিয়ে ব্যবসা করত। তাই আমাদের তালুকদার পরিচয়টা হারিয়ে গেছে। আমরা নেহাৎ মৎস্যজীবী বলেই পরিচিত হয়ে অনেক ঝক্কি-ঝামেলা সয়ে গেছি। আমাদের কেউ আর সেই তালুকদার লেখে না। ১৯২৪ সালের একটি দলিলে আমার দাদার নামের সঙ্গে তালুকদার দেখি। এর আগে জানতাম না যে, আমরা বংশে তালুকদার। আমার আব্বার ব্যবসা ছিল। তিনি ১৯৭১ সালে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার অনেক নৌকা ছিল। পরিবহনের জন্য নৌকা ভাড়া দিতেন। সে যুগে পাকা রাস্তাঘাট ছিল না বলে নৌকার বেশ গুরুত্ব ছিল।

শিশুকালের কোন গল্পটি আজও মনে পড়ে?

ছোটবেলা নানাবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। একদিন খেলা করছিলাম। এ সময় কোত্থেকে যেন এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমাকে দেখে বলে ওঠে, 'এই ছেলে, আরে বাপরে বাপ! এই ছেলের বাবা গভীর রাতে নদী পার হয়ে ওষুধ আনতে গিয়েছিল।' আম্মা অন্দর থেকে ঠাকুরের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তিনি পরে আমাকে বলেছেন, ঘটনাটি সত্য।

আমার বয়স তখন দুই বছর। প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল। আমার আম্মা তার বাহুতে একাধিক দাগ দেখিয়ে বললেন, 'এগুলো তোমার কামড়ের দাগ।' আমি বললাম, 'আমাকে এত কামড় দিতে দিলেন কেন?' বললেন, 'আমার ছেলে যদি কামড় দিয়ে একটু শান্তি পায়, সেটাই ছিল আমার জন্য শান্তি!' কচি দাঁতের কামড়ে আম্মার বাহু থেকে ঝরঝর করে রক্ত বয়ে গিয়েছিল। আব্বা ছিলেন জ্ঞানী লোক। পুঁথিশাস্ত্রের পণ্ডিত। ওই সময় আশপাশে কোনো ডাক্তার ছিল না। গভীর রাতে বর্ষায় উন্মত্তা সুরমা নদী এক জেলে-নৌকার সাহায্যে পার হয়ে গেলেন ডাক্তারের খোঁজে! কিন্তু তখন রাত আড়াইটা-তিনটা। মানুষজন নেই। ডাক্তারের বাড়ি চেনেন না। পরে তিনি ওই গ্রামের মসজিদে গিয়ে আজান দেন। সেই আজান শুনে এক মুরব্বি ছুটে আসেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আজানের সময় কি হয়েছে যে, আপনি আজান দিলেন?' আব্বা বললেন, 'আমি মূলত আজান দিয়েছি কাউকে পাওয়ার